দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 12 MAR 2016
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৪

শিশুর কাঁধে অতিরিক্ত বইয়ের বোঝা

অনুমোদন নেই অনেক বইয়ের, তবু পাঠ্য করছে স্কুলগুলো, নীরব শিক্ষা প্রশাসন

■ নিজামুল হক

শিক্ষার্থীদের স্কুল ব্যাগের ওজন কমাতে পাঠ্যবইয়ের সংখ্যা কমানো দরকার বলে মনে করেন শিক্ষাবিদ ও চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা। অথচ বাণিজ্যিক ভাবনা থেকেই শিক্ষার্থীদের কাঁধে অতিরিক্ত পাঠ্যবইয়ের বোঝা তুলে দিচ্ছে স্কুল কর্তৃপক্ষ। যদিও কোন্ শ্রেণিতে কোন্ বই পড়তে হবে তার তালিকা দিয়েছে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি)। এর বাইরে বই পাঠ্য না করার জন্য আইনও (এনসিটিবি আইন ১৯৮৩, ধারা ১৫.১) রয়েছে। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে, শিক্ষার্থীদের জন্য এনসিটিবি যে বই দিতে বলেছে তার চেয়ে কমপক্ষে ৩ থেকে ১০টি পর্যন্ত বেশি বই পাঠ্য করা হচ্ছে স্কুলগুলোতে। কিন্ডারগার্টেনগুলোর অবস্থা আরো ভয়াবহ। কোনো কোনো কিন্ডারগার্টেনে বইয়ের সংখ্যা ২০টিরও বেশি। বছরের পর বছর ধরে একই অবস্থা চললেও মন্ত্রণালয়সহ শিক্ষা প্রশাসন আইন অমান্যকারীদের প্রশ্রয় দিয়েই যাচ্ছেন বলে অভিযোগ অভিভাবকদের।

প্রসঙ্গত, ২০১২ সালের ২৫ জানুয়ারি ভারতের দিল্লির এক স্কুলছাত্র বরুণ জৈনের করুণ কাহিনী সবার নজর কেড়েছিল। ঘটনার দিন কিছুতেই সে আর ব্যাগের ভার বইতে পারছিল না। হঠাৎ স্কুলের সিঁড়ি থেকে পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ৬

শিশুর কাঁধে

২০ পৃষ্ঠার পর

পড়ে যায়। পুরো ভারতকে কাঁদিয়ে সেদিনই ছেলেটি চলে যায় না ফেরার দেশে। এ ঘটনা গোটা বিশ্বকে নাড়া দেয়। দাবি ওঠে শিশুদের বইয়ের বোঝা কমানোর।

সংশ্লিষ্টরা বলছেন, অতিরিক্ত বইয়ের বোঝার কারণে শারীরিক চাপের পাশাপাশি মানসিক চাপও বয়ে বেড়াতে হয় শিক্ষার্থীদের। একজন শিশুকে কখনো তার নিজের ওজনের ১০ শতাংশের বেশি বোঝা বইতে দেয়া যাবে না। সেদিক থেকে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণিতে পড়ুয়া ছাত্রদের ব্যাগের ওজন হবে এক থেকে সর্বোচ্চ দুই কেজি। তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির তিন কেজি। পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণির শিশুদের চার কেজি। আর নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের ব্যাগের ওজন হতে পারে সর্বোচ্চ ছয় কেজি। অথচ বাস্তব চিত্র ভিন্ন।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, রাজধানীর বিভিন্ন স্কুলে ১৩টি পর্যন্ত বই পড়তে হচ্ছে দ্বিতীয় থেকে চতুর্থ শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীদের। মাধ্যমিক পর্যায়ে এ সংখ্যা আরো বেশি। জাতীয় শিক্ষাক্রম অনুসারে, দ্বিতীয় শ্রেণিতে তিনটি, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণিতে শিশুদের সর্বোচ্চ ছয়টি বই পড়াতে হবে। এর বাইরে কোনো বই পাঠ্য করা যাবে না।

সরেজমিনে রাজধানীর মিরপুর ১০ নং সেকশনের একটি স্কুলে গিয়ে দেখা গেছে, চতুর্থ শ্রেণিতে বোর্ড অনুমোদিত তিনটি বইয়ের বাইরে তাদের রয়েছে ৬টি অতিরিক্ত বই। এছাড়া খাতা, খাবার, পানির পট মিলে শিক্ষার্থীদের ব্যাগের ওজন দাঁড়িয়েছে চার কেজির বেশি।

তৃতীয় শ্রেণিতে বোর্ড অনুমোদিত বইগুলো হলো: বাংলা, ইংরেজি, গণিত, ইসলাম ধর্ম, বিজ্ঞান এবং বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়। কিন্তু মিরপুর ১৪ নম্বর সেকশনের একটি স্কুলে এর বাইরে সিলেবাসে অন্তর্ভুক্ত বইগুলোর মধ্যে রয়েছে অক্সফোর্ড রিডিং সার্কেল, অ্যাক্টিভ ইংলিশ বুক-২, অ্যাক্টিভ ইংলিশ ওয়ার্ক বুক, ইংলিশ হ্যান্ড রাইটিং বুক ও আনন্দ পাঠ।

নজরুল ইসলাম নামে এক অভিভাবক অভিযোগ করলেন, মনিপুর, ভিকারুননিসা নূনসহ রাজধানীর ৯৫ ভাগ স্কুল আর্থিক সুবিধা পাওয়ার জন্য শিক্ষার্থীদের ওপর অতিরিক্ত বইয়ের বোঝা চাপিয়ে দিয়েছে। মনিপুর স্কুলের অভিভাবক সাইদা সুলাতানা জানান, মনিপুর স্কুলের ষষ্ঠ শ্রেণিতে বোর্ডের বাইরে তিনটি বই পাঠ্য করা হয়েছে। এগুলো হলো ভাষা শৈলী মূল্য ২৮০ টাকা, ইংরেজি গ্রামার মূল্য ৩৯৫ টাকা এবং তথ্য ভাণ্ডার মূল্য ৪২৫ টাকা। ফলে বোর্ডের বই বিনামূল্যে পেলেও শিক্ষার্থীদের বাড়তি ১১শ টাকা গুনতে হয়েছে। এভাবে প্রতিটি শ্রেণিতে বাড়তি বই, অভিভাবকদের পকেট থেকে যাচ্ছে বাড়তি টাকা।

গোপন চুক্তি, কমিশন বাণিজ্য: বাড়তি বই দেয়ার পেছনে রয়েছে অনৈতিক কমিশন বাণিজ্যের অভিযোগ। জানা গেছে, প্রকাশনা সংস্থাগুলো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানের কাছে ঘুষ দিলেই সংশ্লিষ্ট স্কুলে ওই প্রকাশনীর বই পাঠ্য হয়ে যায়। বইয়ের মানের বিষয়টি আর বিবেচনা করা হয় না। বছর শেষে বিভিন্ন প্রকাশনা সংস্থার বাণিজ্যিক বিভাগের কর্মচারীরা স্কুলে গিয়ে প্রধান শিক্ষকের সাথে বৈঠক করেন। বইপ্রতি কত কমিশন দেয়া হবে তা নিয়ে দেন-দরবার শেষে অলিখিত চুক্তি হয়। বই পাঠ্য তালিকাভুক্ত করা হবে এমন নিশ্চয়তা দিলে নগদ টাকা প্রধান শিক্ষকের হাতে তুলে দেয় সংশ্লিষ্ট প্রকাশনা সংস্থার লোক। স্কুলে শিক্ষার্থী সংখ্যা বেশি হলে কমিশনের পরিমাণও বেড়ে যায়।

একটি সূত্র জানিয়েছে, বইপ্রতি স্কুল কর্তৃপক্ষ ৩০ থেকে ৪০ শতাংশ পর্যন্ত কমিশন পান। এ ক্ষেত্রে ৫শ টাকার একটি বইয়ে স্কুল কর্তৃপক্ষের কমিশন ১৫০ থেকে ২শ টাকা। প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৫ হাজার হলে একটি বইয়ের জন্য স্কুল কর্তৃপক্ষ পান ৭ লাখ ৫০ হাজার থেকে ১০ লাখ টাকা পর্যন্ত। এভাবে অনৈতিক সুবিধা নিয়ে একটি স্কুলে ১০ থেকে ২০টি পর্যন্ত বাইরের বই পাঠ্য করা হয়। কোথাও কোথাও প্রধান শিক্ষকের বাসায় বসেই এ চুক্তি হয়। পুরো এই প্রক্রিয়ায় জড়িত থাকে প্রতিষ্ঠান পরিচালনা কমিটিও, কমিশনও ভাগ হয় পদ-পদবি অনুসারে।

পাল্টেছে কৌশল : দুবছর আগে পাঠ্যবইয়ের পাশাপাশি যেসব বই কিনতে হবে তার একটি তালিকা শিক্ষার্থীদের হাতে তুলে দেয়া হতো। এ ছাড়া স্থানীয় বই বিক্রির দোকানগুলোতেও তালিকা পাঠিয়ে দেয়া হতো, যাতে শিক্ষার্থীরা নির্দিষ্ট বইটি কিনতে পারে। এখন কৌশল বদলেছে। শ্রেণি শিক্ষক প্রধান শিক্ষকের নির্দেশমতে শিক্ষার্থীদের মৌখিকভাবে জানিয়ে দেন, যাতে স্কুল কর্তৃপক্ষের লিখিত কোনো নির্দেশনার প্রমাণ না পাওয়া যায়।

এদিকে অনৈতিক সুবিধার জন্য বাড়তি বই পাঠ্য তালিকাভুক্ত করা হলেও স্কুল কর্তৃপক্ষ বলছে অন্য কথা। রাজধানীর একটি স্কুলের শিক্ষক হাফিজুর রহমান বলেন, এনসিটিবির বই ততটা সময়োপযোগী নয়। এ কারণে তারা বাইরের বই দিচ্ছেন। এটা আইনবিরোধী জেনেও তা করছেন। রাজধানীর রহমাতুল্লাহ স্কুলের শিক্ষক আবুল বাসার হাওলাদার বললেন, অনেক স্কুলই তো এভাবে বই পড়াচ্ছে। কারণ হিসাবে তারা বলছেন, প্রায় সব স্কুলেই তো বই পাঠ্য করা হয়, এ ছাড়া সরকার তো কিছুই বলছে না। সরকারের এ নীরবতাই সম্মতির লক্ষণ বলে তারা দাবি করেন।

এ ব্যাপারে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান অধ্যাপক রতন সিদ্দিকী বলেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এনসিটিবির নির্ধারিত বই পড়াতে হবে। এর বাইরে কোনো বই কোনোভাবেই পাঠ্য করা যাবে না, করলে তা হবে আইনের লঙ্ঘন। এনসিটিবির ব্যাকরণ বই মানসম্মত নয়— এমন অভিযোগের বিষয়ে তিনি বলেন, একজন শিক্ষকের বছরে একটি বিষয়ে ১৮৯ ঘণ্টা (৫০ মিনিটে ঘণ্টা হিসাব করে) পড়ানোর সুযোগ আছে। এ বিষয়টি বিবেচনা করেই বই প্রণয়ন করা হয়েছে। যারা অনুমোদনহীন মোটা বই শ্রেণি কক্ষে পাঠ্য করেন, তা নিশ্চয়ই ব্যবসার উদ্দেশ্যে।

চেয়ারম্যান আরো বলেন, এনসিটিবির বইয়ের বাইরে যাতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোনো বই পাঠ্য করা না হয় তা তদারকির জন্য মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর এবং প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরে আমরা চিঠি দিয়েছি। এটা দেখার দায়িত্ব তাদের বলে তিনি জানান। এ ব্যাপারে কথা বলতে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ফাহিমা খাতুনের মোবাইলে বেশ কয়েকবার ফোন করা হলেও তিনি রিসিভ করেননি।